দুপুরের রোদ

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

ঠা স বুনোট ভিড় ভেঙে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে পার্থ দেখল পুরোপুরি এগারোটা বেজেছে। ভিড়ের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে পার্থ সিদ্ধান্ত নিল, সে আজ স্কুলে যাবে না। কারণ সে এগারোটা দশের মধ্যে শোভাবাজারে পৌঁছাতে পারবে না, সাড়ে এগারোটা অবশ্যই বেজে যাবে। এ মাসে চারবার লেটমার্ক বসেছে। আজ সে লেটমার্ক বসাতে চায় না। আজ সে স্কুলেই যাবে না।

শহরতলির মানুষজনদের সাথে সে হাওড়া স্টেশনের গেট পেরোলো। পার্থ এখন কোথায় যাবে? সে ব্রিটিশ কাউন্সেল লাইব্রেরীতে যেতে পারে। সেখানে আফ্রিকান লিটারেচারের ওপর একটা বই এসেছে । সেটা সে আজ পড়তে পারে, প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করেও আনতে পারে। কিন্তু সেখানে যেতে ওর ভাল লাগছে না। সে ন্যাশানাল লাইব্রেরীতেও যেতে পারে। ওর প্রিয় কবি মায়াকভস্কির কবিতার বই নিয়ে দুপুরটা কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেখানেও যেতে পার্থর ভাল লাগছে না। সে বঙ্গীয় সাহিত্যে পরিষদেও যেতে পারে। সুন্দরী পাঠিকার মুখোমুখি বসে হাতে বই নিয়ে কবিতার বিষয় ভাবতে পারে। পার্থর সেখানে যেতেও আজ ইচ্ছে করছে না। ওর এক প্রিয় ছাত্র আছে, সে বেশ্যাপুত্র। সোনাগাছিতেই থাকে। অনেকবার যেতে বলেছে। ছাত্রের মার সাথে এবং আরও বেশ্যাকন্যাদের সাথে আড্ডা মেরে দুপুরটা কাটিয়ে আসতে পারে। ওর সেখানেও যেতে ইচ্ছে করছে না। আহিরীটোলা - কুমারটুলীর বস্তির অলিগলি ঘুরে ওদের ম্লান জীবন যাত্রা দেখে আসতে পারে ছায়াঘেরা স রাস্তা দিয়ে। না, পার্থ আজ সেখানেও যাবে না।

পার্থ যাবার কথা আর ভাবছে না। সে শহরতলীর ব্যস্ত মানুষজনদের সাথে সাব - ওয়ের তলা দিয়ে মুখস্তের মতো হাঁটতে হাঁটতে

পনেরো নম্বর বাসট্যান্ডে চলে আসে যেন একটা কচ্ছপ এসেছে। স্ট্যান্ডে একটিমাত্র দোতলা সরকারী বাস দাঁড়িয়ে আছে নিঃস্ব মানুষের মত। পার্থ একতলার ভেতরটা দেখে। সেখানে সিট খালি নেই। সে দোতলায় যায়। চারাদিকে তাকিয়ে সে একটা ফাঁকফোকর খুঁজে বার করে এবং বসে পড়ে। কয়েকটা নথগতি নিশ্বাসের পর পার্থ ভাবে, সে কেন হঠাৎই পনের নম্বর বাসে এসে উঠল। তাহলে সে কি তনুকার প্রিয় বান্ধবী ভারতীদের বাড়িতে যেতে চায়? ভারতীদের বাড়িতো গৌরীবাড়ি, পনের নম্বর বাস-রাস্তার উপর। বাস ছেড়ে দিল। পার্থ বসেই রইল। বাস চলছে। দশ মিনিট চলার পর পার্থ ঢুলছে। সে এখনও জানে না সারাটা চড়া দুপুরে সে কি করবে? বিকেল হলেই লিটল ম্যাগের বন্ধুরা কফিহাউসে আসতে থাকে। তখন সে সেখানে যেতে পারে। মুক্ত সময়ের স্রোতে সে প্রায়দিনই গা ভাসিয়ে দেয়। আজও সে রকম একটা দুপুরের দিন। ভারতীদের বাড়ি যাবে এমন ভেবে সে বাসে ওঠেনি। বাসটাই যেন পার্থকে ভারতীদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। তনুকার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম এই ভারতী। এর কারণ তনুকা নিয়মতান্ত্রিক পরিবারের মেয়ে। তবু সে মাঝে মধ্যে তনুকাদের বাড়ি যায় নিয়মকে মান্য করেই। তনুকা এখন কি করতে পারে? সে এতক্ষণে মর্নিং কলেজ থেকে ফিরে এসেছে নিশ্চয়। তনুকা গান শেখে। রবীন্দ্রসংগীত। সেকি তাহলে হারমনিয়ম নিয়ে গান প্র্যাকটিশ করছে? তনুকা টিউশনি করে। সে কি তাহলে

টিউশনি করতে গেছে এই অসময়ে? তনুকার ছোট দুই ভাই আছে। তাহলে ও কি ভাইদের স্নান করাচ্ছে? 'সে দুপুরে কি করে?' — এই প্রশ্ন পার্থ কোনদিন তনুকাকে করেনি। তনুকা, পার্থের কাছে ভালবাসা দিয়ে গড়া এক চলমান মূর্তি। তনুকা পাশে থাকলে ভালবাসা জেগে ওঠে। তনুকা পাশে না থাকলে ভালবাসা ঘুমিয়ে থাকে। তনুকা আসার আগে ভালবাসা কাকে বলে, পার্থ জানতো না। তখন সে প্রথাবিরোধী ছোটগল্প লিখছে, কবিতা লিখছে। তখন ছোটগল্প ও কবিতা ছিল ওর প্রথম প্রেম, প্রথম আকর্ষণ। দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল নারীর আতপ্ত শরীর। তনুকাই নিয়ে এসেছে ভালবাসার সমুদ্র, ভালবাসার পাহাড়, ভালবাসার শষ্য আকীর্ণ বিশাল প্রান্তর। পার্থর লেখা পাল্টে গেছে। সমাজবিজ্ঞান মনস্কতার সাথে অতল ভালবাসা যুক্ত হয়েছে। পার্থর অবাক লাগে, সে অনেক মেয়েবন্ধুদের সাথে মিশেছে, আড্ডা মেরেছে, বাড়ি গেছে। এমনকি শারীরিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছে হাতে গোনা কয়েকজন বিবাহিত- অবিবাহিত স্বচ্ছল মেয়েবন্ধুদের আদরে- আবদারে। আবার অস্বচ্ছল মেয়েবন্ধুদের দ্বারা অকারণে অপমানিত হয়েছে, শুনতে হয়েছে 'যদি বিয়ে করেন তাহলে গায়ে হাত দেবেন'। কিন্তু ওরা কেউ একজনও পার্থর ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা ভালবাসা জাগাতে পারেনি। একমাত্র তনুকা পেরেছে, যদিও তনুকার সাথে গভীর চুম্বন ছাড়া আর কোনও শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। এমনকি পার্থর চুম্বনে তনুকার আগ্নেয় শরীরও সংযমে সংযত। তনুকার শরীরের আকর্ষনীয় ভাষা আকুল আবেদন জানায়নি পার্থকে 'এই নাও আমার শরীর তোমাকে দিলাম' এবং তখন তনুকার উদ্ভাসিত চোখেমুখে পার্থ দেখতো তনুকার শরীর থেকে একটা তাজা নদী বেরিয়ে এসে সমতল ছুঁয়েছে । তনুকার ভাবনা থেকে সরে আসতেই পার্থ ঢুলতে থাকে। একজনের কাঁধে পার্থর অংশিক মাথাটা পড়তেই মোটা বাসযাত্রীটি বলে 'ও মশাই আপনার মাথাটা আপনি সামলান।' চোখ বোজা পার্থ চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে। বাইরে তাকায়। দেখে 'খান্না' পেরিয়ে দোতলা বাস গৌরীবাড়ি স্টপেজের দিকে ছুটছে। সেখানে বাস থামতেই পার্থ নেমে পড়ে। কালো ইট বের করা পুরানো বাড়ির দোতলা থেকে ভারতী পার্থদাকে দেখতে পেয়ে সদরে এসে দাঁড়ায়। ভারতীর মুখে হাসির কামিনী ফুল। ভারতী পার্থর হাত ধরে দোতলায় নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়। এই ঘরেই তনুকা পার্থকে প্রথম চুম্বনে অভিষিক্ত করেছিল। পার্থ অনেক রমণীকে চুমু খেয়েছে, কোন রমণীই আপত্তি করে নি। কিন্তু পার্থকে কেউ প্রথমে চুমু খায় নি। হঠাৎ এক আগুনে পাখি উড়ে এসে পার্থর ঠোঁট ঠুকরে দিয়েছিল সে দিন। ভারতীর এই পার্থর কাছে ভালবাসার মিউজিয়াম।

ওদের বাড়িটা সেরকম নয় যেখানে থাকে একটা বসার ঘর এবং সেই ঘরটায় ফার্নিচারে, সেগুনকাঠের সোফাসেটে, বই-এর লো আলমারিতে বই সাজানো থাকে। ভারতীদের তিনবোনের শোবার ঘরেই পার্থরা বসে, পার্থ আর তনুকা। আজও ভারতী পার্থকে ভালবাসার মিউজিয়ামে নিয়ে বসাল। ঘরটা সর্বদাই অগোছালো থাকে। একটা পুরানো খাট। খাটে তিনটি পায়া। একটা পায়া তিনটিইঁটের ওপর বসানো। দুবোনের শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ ভেতর জামা ছড়ানো। সেসব খাটের এককোণে সরিয়ে ভারতী পার্থকে বসতে দেয়। তারপর বলে, স্কুলে যাননি? পার্থ চটপট উত্তর না দিয়ে একটি ময়লা বালিশ টেনে নিয়ে কাত হয়ে হেলান দিয়ে একটি হাই তুলে উত্তর দেয়,' যাব বলেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু আর গেলাম না। ভাল্লাগছে না।' তারপর একটি পুরানো রোববারের কাগজ পড়তে পড়তে, পার্থ ভারতীকে বলে, ' তনুকাকে একবার ডেকে আনো'।

ভারতী অবাক হয়ে জানতে চায়,'কেন ?কিছু হয়েছে? পার্থ ভারতীর দিকে না তাকিয়ে উত্তর দেয়, ' আরে দূর! ওসব আমাদের হয় না। বেড়াবো'। ভারতী আরও বিস্মিত হয়ে বলে, ' এই দুপুরে, এই রোদ্দুরে ! যা গরম পড়েছে! কি প্রেমরে বাববাঃ! এরকম প্রেমিক বাপের জন্মেও দেখেনি। আমি হলে —' পার্থ ভারতীর কথাগুলো শুনে ছটপট উঠে বসে। বলে 'তুমি হলে কি করতে জানতে চাই না। তুমি যাবে? তনুকাকে ডেকে আনবে?

ভারতীর মুখে কিন্তু ভোরের কামিনী ফুল লেগেই থাকে, ' সে আমি যাচ্ছি পার্থদা। কিন্তু তনুকা কি আসবে? এমনিতেই ও গরম সহ্য করতে পারে না। কোনদিন ওকে ম্যাটিনিশোতে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া যায় না। তার চেয়ে বরং আপনিও চলুন ওদের বাড়ি। এই গরমে না বেরিয়ে ওদের ছোট্ট ঠান্ডা ঘরটায় গল্প করবেন'। ভারতীর প্রস্তাব শুনে কোন উত্তর না দিয়ে প

ার্থ আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে। জিনসের প্যান্টের কোমরটা লুজ লাগছে। বেল্ট টা সামান্য টাইট করে। ভারতীকে বলে,'এই দুপুরে ওদের বাড়ি গিয়ে তনুকাকে বিরক্ত করতে পারি, কিন্তু ওদের পরিবারকে বিরক্ত করতে চাই না।' ভারতী খাটের ধারে বসে পার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,' আপনার প্রেমের টানে সবাই না হোক বিরক্ত হবে একটু। তাছাড়া ও বাড়ির সবাই তো আপনাকে ভালবাসে। শুধু আপনার সাথে তনুকার বয়সের পার্থক্যটা ওর মা মানিয়ে নিতে পারছেন ন া। আপনার ত্রিশ, তনুর আঠারো! বাববা! বারো বছরের তফাৎ। আমরাও পারছি না। আমরা তনুকে খেপাই, কি দেখলি ঐ বুড়োটার মধ্যে ।তার চেয়ে বরং ইন্দ্রের সাথে প্রেম কর। চবিবশও পেরোয় নি। বাপের শাড়ির ব্যবসা। হাতিব াগানে একটা মানিকতলায় একটা, দুটো দোকান। ইন্দ্র একমাত্র ছেলে। ঐ মালিক হয়। সেদিন ইন্দ্রের গাড়ি করে বোটা নিক্যাল ঘুরে এলাম। তনুকে কত বল্লাম। গেল না। ইন্দ্র একটু মনমরা হয়েছিল। ইন্দ্র এখনও তনুর কথা বলে।' ভারতীর একটানা কথাগুলো গুত্ব না দিয়ে পার্থ রোববারের আনন্দবাজারটা লের মতো পাকিয়ে ভারতীর হাতে মেরে বলে, ' ওসব কথা একবার বলতে শু করলে থামতে চাও না। যাক গে তুমি যাবে? না কি চলে যাব।

ভারতী উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'আমি যেতে পারি। শ্যামবাজার আর কন্দুর। যাব আর আসব। কিন্তু তনু যদি না আসে, অ াপনার মন খারাপ হয়ে যাবে।

মন খারাপের কথাটা পার্থ ভাবেনি। ভারতীর কথা শুনে ভাবনাটা এলো। পার্থ সিগারেট খায় না। বন্ধুরা বলে, ভাবনা চিন্ত া সিগারেট অনেকটা হাল্কা করে দেয়। তনুকা অন্যমেয়েদের মতো কোনদিন বলে নি, সিগারেট না খেলে পুরুষদের পুষ বলে মনে হয় না। বরং বলেছে পার্থর ছোটছোট চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে, টিকালো নাক ও নির্মেদ অমসৃণ মুখের দিকে তাকিয়ে ' এরকম মুখে সিগারেট মানায় না। এরকম মুখে কঠিন চুমু তৃপ্তির সাথে খাওয়ার সময় যদি সিগারেটের গন্ধ প াওয়া যায়, তাহলে সেটা আমার কাছে অসহ্য। সিগারেটের গন্ধ আর মদের গন্ধ আমার একেবারেই ভাল লাগে না।

এখানেই শেষ নয়। সেদিন তনুকা আরও বলেছিল, চুমুর সাথে ভালবাসার একটি গভীর সম্পর্ক আছে। পার্থ সেদিন তনুকার অনেক কথা শুনে অবাক হয়েছিল। কিন্তু তনুকা পার্থর শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, পার্থও না। যদিও তনুকার মুখে চুমু শব্দটা ফস্ করে পার্থর চাপা বাদ শরীরটা জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু পার্থ ওকে চেপে ধরে বুকের কাছে টেনে আনতে প ারল না। কারণ সেদিন ওরা টালাপার্কে বসে গল্প করছিল। তখনও বিকাল তার ঘরের কপাট বন্ধ করে নি। পার্থ শুধু তনুকার হাতটা চেপে ধরেছিল। তনুকা অনুভব করলো পার্থর হাতের উষ্ণতা । পার্থ তনুকার রমণীয় মুখের দিকে তা কিয়েছিল। সেদিন তনুকাকে মনে হয়েছিল পিকাসোর আঁকা এক যুবতী যে চোখের চাহনিতে বলছে ' থামো, সুন্দর মুহূর্ত'

পার্থ এতক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে তনুকার কথা ভাবছিল। চোখ খুলে দেখে ভারতী চলে গেছে তনুকাকে ডেকে আনতে। পার্থ আবার চোখ বোজে। চটির শব্দ শুনতে পায়। একতলা থেকে দোতলায় উঠে আসছে । চটির শব্দ শুনে পার্থ বুঝতে পারে আরতির চটির শব্দ। আরতি ভারতীর ছোট বোন। আরতি ঢুকেই বলে, ' কখন এলেন পার্থদা। নিশ্চয় তনুদির জন্য। নিশ্চ য়ই দিদি ডেকে আনতে গেছে।' ব্যাপারটা এরকমই। সবাই জানে পার্থ এলে তনুকাকে ডেকে আনতে পাঠানো হয়। পার্থ শুয়েছিল। উঠে বসে বলে আরতিকে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে , ' আধঘন্টা। তুমি কোথায় গিয়েছিলে এই দুপুরে সেজেগুজে?

আরতির পেছনের আঁচলটা পিঠ ঢেকে হাতকাটা ব্লাউজের পাশ দিয়ে এসে নগ্ন হাত চাপা দিয়ে বলে, ' কি আর সাজল াম। আইলাশ করেছি। ------ গেছিলাম ম্যাটিনি শোর টিকিট কাটতে। পুঁতির মালাগুলো বাদলদার বাড়ি পৌঁছে দিতে'। বাড়িতে বসে নানারকম কাজ করে দুবোন, রাখি তৈরির কাজ, পুঁতির মালা তৈরীর কাজ, পেন ফিটিংসের কাজ — এরকম নানারকম। ওদের একটা মন্দির আছে বাড়ির পাশেই। ওটাই শরীকী আয়ের উৎস। ' আপনি শুয়ে থাকুন আমি আসছি'— বলেই আরতি চলে যায়। পার্থ কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে, বারোটা পঁচিশ হয়েছে। পার্থ পুনঃ তনুকার কথা ভ

াবে। যখন তখন ডাকাটা ঠিক হবে না। তনুকা কি আসবে? তনুকারও তো অনেক কাজ থাকতে পারে। তাছাড়া এই দুপুর রোদে কেউ ঘুরতে বেরোয়। কিন্তু পার্থ বদলে গেছে। ওর এখন একা ঘুরতে বেড়াতে ভাল লাগে না। ওর এখন একা সিনেমা নাটক দেখতে ভাল লাগে না। তনুকাকে চাই! তাবলে যখন তখন! পার্থ, তুমি কি একা একা এখনও হাঁটো না ? প ার্থ, এই সেদিনও তুমি একা রূপনারায়ণের নদের ধারে যাও নি? সেখানে গিয়ে কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে রাত কাটাও নি? ব্রাহ্মণ কন্যা তোমাকে চা করে খাওয়ায় নি? বলে নি, তেঁতুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, আবার আসবেন। নিজের কাছে স্পষ্ট হও পার্থ, আসলে তিনঘন্টা সময় কাটাবার জন্যে তোমার এখন দরকার তনুকাকে। পার্থর মধ্যে ভাবনার পাতাগুলে া উড়ছে। পার্থ সিদ্ধান্ত আসে তনুকা না এলে সে চলে যাবে। ডায়মন্ডহারবার লাইনে একটা টিকিট কাটবে। একা একা সে চলে যাবে বিশাল নদীর কাছে। এমন সময় আবার চটির শব্দ সে শোনে। এবার দুজনের চটির শব্দ। বুঝতে পারে পার্থ, তনুকাকে ঠিক ধরে এনেছে ভারতী। ওরা কথা বলতে বলতে উঠে আসছে। তনুকার গলায় স্বরে অস্পষ্টতা নেই, বড়ই সুন্দর তনুকার কন্ঠস্বর, ঝকঝকে তকতকে।

ঘরে ঢুকেই আমাকে আক্রমণ- কন্ঠে বলে তনুকা, ‘ এই দুপুর রোদে স্নান নেই, খাওয়া নেই, কোথায় যাব? কোন চুলোয় ? ’ পার্থ তনুকার মার্বেল পাথর বসানো মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘ আমার কিস্যু ভাল লাগছে না তনুকা। তাই ভাবলাম তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরি। তারপর দুটো আড়াইটার মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে দেব। আমি তোমাকে জোর করবো না তনুক া। যদি পাই , তবে যাই। ’

এবার পার্থর জামাটা তনুকার নজর কেড়ে নেয়। তনুকা বলে ‘ এ্যাঁ মা, তুমি ঐ হলুদ জামাটা, ক্যাট ক্যাটে রঙ, পরেছ কেন? তোমার কোন চিবোধ নেই।

সেই হীরকপ্রভা ছড়ানো হাসিমুখে পার্থ উত্তর দেয়, ‘ ছোট ভাই বললে, তুই জামাটা নিবি? তুই তো ফর্সা, তোকে মান াবে ভাল। আমি লুফে নিলাম। কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

পার্থর টানটান কথাগুলো তনুকার কাছে গুত্ব পায় না। সে বলে ‘ তোমার সাথে বেরোতেই লজ্জা করছে।’ পার্থ কথাটা শোনে। হলুদ জামাটার জন্যে যদি বেরোনোটা ফসকে যায়! হায়, হলুদ সার্ট। হঠাৎ তনুকার সাধারণ শাড়িটা পার্থর নজর কেড়ে নিতেই পার্থ সহজেই বলে ফেলে, ‘ তুমিও তো শাড়িটা পাল্টে আসনি। বাড়িতে পরার শাড়িট া পরেই চলে এসেছ। তবে আমার কিন্তু বেরোতে লজ্জা করছে না। কারণ আমি শাড়ি দেখি না, তনুকা মিত্রকে দেখি।

পার্থ এবং তনুকা ভারতীদের বাড়ি থেকে দ্রুত বেড়িয়ে আসে। ভারতী এবং আরতী দুজনেই বলেছিল তেলেভাজা এবং মুড়ি খেয়ে যেতে। ওরা সময় নষ্ট করেনি দুপুরের তপ্ত রোদের কথা ভেবে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে ‘খান্না’ সিনেমা হলের দিকে যায়। সেখান থেকে বাসে ওঠে। ড্রাইভারের জায়গা পায় প্রায় পাশাপাশি। মানিকতলার মুখেই বাস থেমে যায়।

সামনে মিছিল। দীর্ঘ মিছিল।

বাস থেকে গেছে। বাসের পেছনে সারি সারি বাস, মিনিবাস, টেম্পো, লরি, ট্যাক্সি, এই জট পাকানো যান- বাযন।

তনুকা চুপচাপ। পার্থ মিছিল দেখছে। শ্লোগান শুনছে।

গণহত্যার জবাব চাই।

শ্রমিক- কৃষক হত্যার জবাব চাই—

ছাত্র - হত্যার জবাব চাই

তনুকা পার্থর স্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার কবিতাগুলো শ্লোগানের মতই। তোমার একটি কবিতার লাইন মনে পড়ছে ঃ আমি ভাঙবো, আমি খবো, এই নীল আকাশ, এই নীল বাতাস।'

বাস থেকে আছে । স্তব্ধতা কেটে যেতেই পার্থ বলে ' চলো হাঁটি '। শোনা মাত্রই তনুকা নেমে পড়ে। পেছনে পার্থ।

পার্থ ।। চলো সিনেমায় যাই। নুন শো।

তনুকা ।। না

পার্থ ।। চলো বারে যাই। মাল খাই।

তনুকা ।। না।

পার্থ ।। চলো না পার্ক স্ট্রীটে ভাল রেস্টুরেন্টে যাই। চিকেন চাউমিন খাই।

তনুকা ।। না

পার্থ ।। চলো বন্ধুর ফ্ল্যাটে যাই। খালি ফ্ল্যাট পাব। শুধু কাজের মেয়েটা থাকবে। ওকে বলবো, যা সিনেমা দেখে আয়।

তনুকা ।। না,না ।

পার্থ ।। তুমি বলো কোথায় দুপুরটা কাটাই।

তনুকা ।। তুমি তো বললে ইডেন গার্ডেনে যাবে।

ইডেন গার্ডেন। চারিদিকে ছড়ানো ছোট গাছ, মাঝারি গাছ, বড় গাছ। গাছের শান্ত ছায়া ঘিরে রেখেছে ইডেন সাহেবের বাগানকে। এখানে এলে দুপুর কাছে আসে না। রোদকে চেনা যায় না। একটা বিশাল গাছ, মেহগনি গাছ। গাছের নিচে একটা বেঞ্চ। বেঞ্চে বসে আছে পার্থ আর তনুকা। ব্রিটানিয়া কেক বার করে পার্থ। ভাগ করে খায়। কাঁধ- ঝোলা থেকে পার্থ এবার একটা ঝোলা বার করে। তনুকার ঠোঙাটা। ঠোঙায় ঠাসা বাদাম। পার্থর হাতে কাগজের উপর ঝাল নুন। তনুকা বাদাম ভাঙছে। নিজে খুট খুট করে খাচ্ছে এবং পার্থর হাতে তুলে দিচ্ছে। মেহগনি গাছের ফাঁক দিয়ে দুপুরের চাবুক রোদ ওদের গায়ে তীরের মতো বিঁধছে। শরীর ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে। রক্তের মতো ঘাম শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। পার্থ চারদিকে তাকিয়ে তনুকাকে কাছে টেনে নিয়ে অনু-সেকেন্ডের মধ্যে তনুকার গালে চুমু খেয়ে নেয়। ' এই ছাড়, কি হচ্ছে এখানে, অসভ্য কোথাকার' এইসব কথা বলার সুযোগই পায় নি তনু। সকালের জানালা খোলা মাত্র যত দ্রুত ভোরের রোদ ঘরে ঢোকে, তার চেয়েও দ্রুত ভোরের রোদের মতো চুমুর স্পর্শে তনুকার আঠারো বছরের ছিপছিপে শরীরে রক্তের বিদ্যুৎ ছুঁয়ে যায়। অনুভবকে স্পর্শ করে। গালে ঝাল নুন আটকে আসে। তনুকার একটু সময় লাগে স্বাভাবিক

হতে। তারপর বলে ‘ আগুনে দুপুরে কেউ প্রেম করতে আসে! পার্থ সুন্দর যুক্তি দাঁড় করায়। বলে, ‘ প্রেম করতে আসা কি সাজগোজ, সেন্ট, মাস্কারা, আই-লাইনার? প্রেম করতে আসা কি হাটুঝুল কাঁথাটিচ পাঞ্জাবি গায়েদিয়ে, চোস্তা পরে, বিকেল সন্ধ্যায় দুজনের হাতে ওয়ালসের আইসক্রিম? প্রেম হচ্ছে অনিয়ম, প্রেম হচ্ছে বেপরোয়া, প্রেম হচ্ছে মাঠে ঘাটে যেখানে সেখানে, প্রেম হচ্ছে যে কোন সময়ে, যেকোন মুহূর্তে —’।

তনুকা আগের মতোই ধীর স্থির বাদাম চিবোতে চিবোতে, ‘ থামো পার্থ। ঘামে ব্লাউজটা ভিজে গেছে। গা কুটকুট করছে। দ্যাখো চারদিকে তাকিয়ে, কাউকে এ সময়ে দেখতে পাবে না।’

পার্থ চারদিক তাকিয়ে উত্তর দেয়, ‘ আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। কয়েকজন প্রেম করতে এসেছে। বলেই আঙুল তুলে দুজে াড়া দেখিয়ে দিল। তনুকা দেখে। তারপর বলে , ‘ দূর এরা কি কেউ প্রেম করতে এসেছে নাকি! খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, এরা সব ফুটপাতবাসী। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে। ঝুপড়িবাসীও হতে পারে।’ পার্থ উত্তর দেয়, ‘ আসুক না। হাতে রঙিন প্লাস্টিকের স চুড়ি। আমার জামার মতো ক্যাটক্যাটে হলুদরঙের ব্লাউজ। গাঢ় নীল রঙের ছাপার শাড়ি। ব্লাউজ- শাড়ি ময়লা ছেড়া সেলাই করা হতেই পারে। লাল চুলের খোঁপায় ফিতা জড়ানো, যুবকের গায়ে মেন রঙ এর গেঞ্জি । পরনে ময়লা তেল গন্ধ চেক লুঙ্গি। এদের জীবনে , মনে, শরীরে দুপুরের রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই। বসন্ত কাকে বলে এরা জানে না। অথচ এরাও মানুষ তোমার আমার মতো। এদের মধ্যে প্রেম আছে, ভালবাসা আছে। স্নেহ-মায়া-মমতা আছে।’

তনুকা জানে পার্থ রাজনীতির কথা বলতে ভালবাসে। এরপরই পার্থ রাজনীতির কথায় চলে যাবে। তারচেয়ে দুপুরের রে াদ ভাল, পাশে পার্থ, বলে ‘থামো সুন্দর মুহূর্ত’। এই ইডেনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। এইসব ভেবে অন্য কথায় চলে যায় তনুকা। ‘এই তুমি যে একটা কবিতার বই বের করবে বলছিলে? করবে না?

পার্থ তনুকার পিঠে হাত দিয়ে বলে, ‘করবো। সামনের মাসে, ডি এর টাকাটা পেলেই কাজে হাত দেবো’।

তনুকা পিঠ থেকে পার্থর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, ‘ জানো পার্থ, আমি একশো টাকা জমিয়েছি। আরও জমবে। যখন বের করবে বলবে, তখন দেব।’

ওদের কেক খাওয়া হয়েছে। বাদাম শেষ। পার্থর মা পরোটা সুজি করে দিয়েছিল টিফিনে। সবটা তনুকা খেল না। পার্থকে একটা পরোটা খেতে হয়েছে । এরপরও পার্থ বলে, ‘ ওঠো । দুটো বেজে গেছে অনেকক্ষণ, রোদ চড়ছে। তোমার স্নান খ াওয়া হয়নি। ধোসা খেয়ে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি কফি হাউসে যাব। ওঠো।’

পার্থ উঠে পড়েছে । তনুকা ওকে হাত ধরে বসিয়ে বলে ‘ দ্যাখো দ্যাখো ঐ যে।’

দুপুরের রোদ সাদা বেড়ালের মতো ঢুকে পড়েছে তনুকার শরীরে। রক্তে প্রবাহে দুপুরের রোদ তনুকার শরীরে নদী হয়ে য ায়। পার্থ পুনরায় বসে। ঝুপড়িবাসী যুবকযুবতীটি আরও ঘন ঝোপের আড়ালে চলে গেছে এবং সেখানে দুজনে দুজনকে জাপটে ধরে শরীর পর্বে মেতে আছে। ছবিটা স্পষ্ট নয়। বড় ঘাসের পাতা নড়ছে, ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের নরম পাতা নড়ছে। আলতা মাখা পা দুটো মাঝে মাঝে দেখা যায়। হঠাৎ তনুকা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ে। মাথাটা পার্থর কোলে। তনুকার পায়ে রোদ লাগছে। মুখে ঘনপাতার ছায়া নড়ছে। পার্থ দেখে তনুকা চোখ বুজে শুয়ে আছে। বলে, ‘আমার দিকে তাকাবে না। ডাইরি বের করে কবিতা লেখো। লিখতে ভাল না লাগলে আকাশ দ্যাখো । গাছ-গাছালি দ্যাখো। টুপটাপ পাতা ঝরা দ্যাখো। পাখি দ্যাখো। দুরের যুবকযুবতীকে দেখো না। কষ্ট পাবে। সামনে জলাশয় দ্যাখো।’ পার্থ একটা ঘ াসের ডগা ছিঁড়ে তনুকার মুখে-গলায় হাতে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলে,‘তোমার শরীরেই আকাশ নেমে এসেছে। তোমার

শরীরেই পুঁই গাছ নেমে এসেছে। পুঁইগাছে একঝাঁক প্রজাপ্রতি উড়ে এসেছে। তোমার শরীরটা একটা জলাশয় হয়ে গেছে। সেখানে দুটো নীলপদ্ম ফুটে আছে। সেই পদ্মে বসার জন্য একটি পুষ মৌমাছি চারপাশে উড়ছে। গুনগুন গান করছে।'

তনুকা হঠাৎ উঠে বসে বলে, ' চমৎকার কবিতা। সুর রিয়ালিজম। বলেই এক পলকে পার্থকে কাছে টেনে চুমু খায়। সে সময় পার্থ তনুকার ভারি বুকে হাত রাখে এবং চারদিক তাকিয়ে নিয়ে খানিকবাদে সরিয়ে আনে। শারীরিক স্তব্ধতাটা কেটে যেতেই পার্থ বলে,'তনু, তুমি কি করে জানলে সুররিয়ালিজমের কথা। আমি তো কোনদিন তোমার সাথে এসব সাহিত্যের পরিভাষা নিয়ে কথা বলি না। হ্যাঁ, এটা ঠিক নতুন কবিতা লিখলেই তোমাকে শোনাই।'

তনুকা উত্তর দেয়,' তুমি নও পার্থ, অঞ্জনদা। বাবার অফিসে কাজ করে। অঞ্জনদাও কবিতা লেখে । গালে আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো দাড়ি রাখে। তোমাকে চেনে। বলে তুমি নাকি কবিতা লিখতেই জানো না। তুমি মর্ডান পোয়েট্রি বোঝো না। অঞ্জনদা আমাকে একটা ওর কবিতার বই দিয়েছে। কি সব ভাষা! অশ্লীল, নোংরা। মদ মাগী সাইলিওক এসব শব্দ ব্যবহার করেছে। পত্রিকা বিত্রির সময় পুরানো কাগজওয়ালাকে ঐ বইটাও বিত্রি করে দিয়েছি। ' ঠিক অনুসন্ধানের মন নিয়ে নয়, জানার কৌতুহল নিয়ে পার্থ বলে, ' সে কি প্রায়ই তোমাদের বাড়িতে আসে?' তনুকা খুবই স্বাভাবিকতা নিয়ে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ আসে। বাবার নাম করে আসে। অফিসের নানারকম কথা নিয়ে আসে। আমি বুঝতে পারি, ওসব অজুহাত মাত্র। উদ্দেশ্য আমিই।

পার্থ চুপচাপ। দুপুরের রোদ রক্ত-প্রবাহের মতো তনুকার শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। ঝুপড়ির যুবক-যুবতী চলে গেছে। নির্জন অ াশ্রয়ে এখন দুপুরের ইডেন। একমাত্র কিছু পাখি গাছের আড়াল থেকে নির্জনতা ভাঙছে। তনুকাও পাখির মতো পার্থর নির্জনতা ভেঙে দিয়ে বলে,' একদিন বিরক্ত হয়ে বাবাকে বললাম, অফিসের কথা জানাবার জন্য অঞ্জনবাবুকে কি দালাল রেখেছো? ' বাবা রাগ না করেই বলেছিল, 'ওভাবে বলছিস কেন তনু? ও অ্যাকাউন্টস অফিসার। মোটা টাকা বেতন প ায়। তোর ঐ ছোকরাটার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ । পার্থ তো সামান্য মাস্টার। কোন স্ট্যাস্টাস নেই।' তনুকার দৃপ্ত ভাষণ শুনেও পার্থ কখনও অন্যমনস্ক, কখনও চুপচাপ। তনুকা পার্থর চুপচাপের ভেতরে চলে যায়। সেখান থেকে সে বলে, এরপর যে সময়টায় অঞ্জনদা আসতেন, সেসময় আমি বাড়ি থাকতাম না ইচ্ছা করেই। পার্থ তুমি চুপচাপ কেন? কথা বলছো না কেন? তোমাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। তোমাকে চুমো খেতে ইচ্ছে করছে। ' পার্থ প্রসঙ্গ থেকে সরে আসে। কড়া রে াদ পার্থর শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে। কড়া রোদ তনুকার ভেতর প্রবেশ করছে। পার্থ আপ্ত বাক্য উচচারণ করে, ' তোম ার নাকে রোদ লাগছে। মুসুরদানার মতো সোনার নাকছাবিটা রোদে চিকচিক করছে। চলো ঘরে ফিরি। তোমার স্নান হয়নি । তোমার খাওয়া হয়নি। ' পার্থর ওসব কথার উত্তর দিল না তনুকা। তনুকার সারা মুখে শাল পাতার ছায়া এবং দুপুরের রোদের টুকরো। এ এক অপরূপ প্রাকৃতিক অলংকার তনুকার মুখে। তনুকার সোনালী শরীরের ভেতরে দুপুরের রোদ রক্তের সাথে খেলা করে। তনুকা মদের গ্লাসে দুপুরের রোদ ঢেলে নিয়ে একটু একটু করে পান করে। পার্থর সার্টের একটা বোতাম খুলে দেয়। লোমশ বুকে হাত বুলায় তনুকা। পার্থ তনুকার উষ্ণ হাত সরিয়ে দেয় যেন সে হলুদ শালিকের নরম পালক ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিল।

আর ঠিক সেই সময়ে তনুকার ধারাল দৃষ্টিতে এক পথের বুড়ি উঠে আসে। চোখের ক্যামেরায় প্রথমে উঠে আসে একগুচ্ছ জট পাকানো সাদা চুল, পরে কুঞ্চিত কালো মুখ, তারপর আসে ময়লা ছেঁড়া সাদা থান, শুকনো ডালের মতো স হাত। শালবৃক্ষের নিচে সেই বুড়ি জড়োসড়ো হয়ে পুরনো রংচটা কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে। বুড়ি চারদিকে ত াকাচ্ছে, যেন কিছু খুঁজছে। এই দৃশ্য পার্থকে তনুকা দেখায়। দৃশ্যটি দেখে কবি পার্থ বসু মন্তব্য করে, 'যথার্থ বাংলাদেশ। স্ব াধীনতার পঞ্চাশ বছরে ভারতবর্ষের উপহার । কিন্তু কখন এলো এখানে। এতক্ষণ আমাদের কারোর চোখে পড়ে নি।' তনুকা বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে পার্থকে প্রশ্ন করে, 'পার্থ লক্ষ্য কর বুড়ির মুখে স একটা হাসির রেখা। তাই না?' পার্থ

বুড়ির মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে উত্তর দেয়, ‘ ওটা হাসির রেখা নয়। ওটা কুঞ্চিত মুখের শুকনো চামড়ার বলিরেখা। ঘন শালপাতার ফাঁক ফোকর দিয়ে চিকন রোদ মুখে পড়ায় হাসির রেখা মনে হচ্ছে যেমন মপথিকেরা মরীচিকাকে ভুল করে।’ এসব কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎই তনুকা বাংলা-বাড়ির মুখের দিকেতাকিয়ে গুনগুনিয়ে গান ধরে নিচু গলায়, ‘ কেন চেয়ে আছো গো মা, মুখ পানে। এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে, আপন মায়েরে নাহি জানে।’ পার্থ মগ্ন হয়ে গান শোনে বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে। গান শেষ হতেই পার্থ উঠে দাঁড়ায়। বলে তনুকার হাত ধরে, ‘ এবার চলো। ওঠো। রোদের তাপ বাড়ছে। একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। তোমার তো খিদেও পেয়েছে। বাড়িতে আবার তোমাকে ঝামেলা পোহাতে হবে। স্নান নেই, খাওয়া নেই।’ তনুকা পার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘পার্থ’। তনুকার কণ্ঠস্বর আটকেযায়। ন স্বকণ্ঠে বলে, ‘আরেকটু বসি। চলো ঐ শালবৃক্ষের ছায়ায় বসি বুড়ির পাশে। ’ ওরা সেখানে যেতেই বাংলা-বুড়িটা চলে য ায়। তনুকা বাংলা বুড়িটার জায়গায় বসে। পার্থ বসে না। দুপুরের রোদের তেজ। দুপুরের রোদের আগুনে নিশ্বাস পার্থর শরীরে ছোবল মারছে। তনুকা পার্থর দুটো আঙুল হাতের মুঠোয় চেপে বলে , ‘ আরেকটু বসি। এই দুপুরকে আমি আর কোনদিন পাব না। এসো পার্থ, আরেকটু বসি। ’ দুপুর হাই তোলে। দুপুরের ঘুম পায়। দুপুর ঘুমিয়ে পড়ে।

ষাট বছর বয়সেও পার্থ এই অয়েল পেন্টিং স্মৃতিটা ভুলতে পারেনি। এখন দুপুর। পার্থর সামনে গ্রিলের জানালা খোলা। দুপুরের রোদ বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে। জানালা দিয়ে পার্থ দেখতে পাচ্ছে আবার আরেকজন বাংলাবুড়ি ফুটপাতে বসে আছে বেটেখাটো গাছের ছায়ায় নিচে। সেই একগুচ্ছ সাদা চুল, পরণে ময়লা ছেড়া থান, বলিরেখায় এলোমেলো সাজ ানো কুঞ্চিত শুকনো কালো মুখ। সেদিনকার সেই বাংলাবুড়ির মতো। পাশের ঘরে তনুকা ঘুমোচ্ছে। একটা কলিংবেলের আওয়াজ শুনতে পায় পার্থ। ফ্ল্যাটের দরজা খোলে সে। সামনে পিয়ন। দুটো বড় খাম হাতে নেয় পার্থ। সই করে। দরজা বন্ধ করে বেতের সোফায় হেলান দিয়ে বসে। দুটো খাম খোলে। নাতি-নাতনির ফটো পাঠিয়েছে আমেরিকা থেকে পার্থর একমাত্র ছেলে হিরন্ময়, ইংল্যান্ড থেকে কন্যা হিনু। পার্থর শোবার ঘরে তনুকার কাছে যায়। কলিংবেলের আওয়াজে তনুকা চোখ মেলে তাকিয়েছে। তনুকাকে বলে, ‘ একবার উঠে এসো। ’ তনুকা পার্থর পড়ার ঘরে যায়। খোলা জানালার দিকে আঙুল তুলে বাংলা বুড়িকে দেখিয়ে ষাট বছরের কবি পার্থ বসু তনুকাকে স্মরণ করাতে চেষ্টা করে ‘ সেই গানটা মনে আছে? ’ তনুকা পার্থর কথায় কান না দিয়ে জানতে চায়, ‘ কে এসেছিল?’ পার্থ জানায় ‘ তোমার ছেলেমেয়ের চিঠি , নাতি নাতনির ফটো’ বলেই পার্থ পুনরায় বলে, ‘ তনু সেই গানটা — ’। তনুকা চোখ ছড়িয়ে দেয়। চোখ চলে যায় বাংলা বুড়ির কাছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক মহীয়সী গৃহিনীর গলা থেকে বেরিয়ে আসে ‘ কেন চেয়ে আছো, মুখপানে, এরা চ াহে না তোমাকে চাহে না যে, আপনার মায়েরে নাহি জানে —’।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com